শেয়ার বাজার থেকে অর্থ সংগ্রহে জালিয়াতি

বাজারে শেয়ার ছাড়ার আগেই কারসাজি করর সাধারণ বিনিয়োগকারীদেরকে স্বর্বস্বান্ত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হচ্ছে একাধিক কোম্পানি। কিভাবে হচ্ছে এই জালিয়াতি?

...অনুসন্ধান করেছেন **হানিফ মাহমুদ**

রাজধানী ঢাকার দিলকুশা এলাকার চাঁদ ম্যানশনের সাত তলায় আইএইচএস ইন্সপেকশন সার্ভিসেস বিডি লিমিটেডের দু' কামরার অফিসে ঢুকতেই প্রথমে অনেকগুলো চটের বস্তা নজরে আসে। অফিসের ভেতরে এরকম আরো অনেকগুলো বস্তা। এর মধ্যে ৪ থেকে ৫টি টেবিল সাজানো আছে। এরকম অবস্থায় বসেই বিভিন্ন কোম্পানির সম্পদের মূল্য নিরূপণের কাজ হয়। কোম্পানির ব্যবস্থাপক মিজানুর রহমান জানালেন, তারা মূলত জার্মান এই কোম্পানির কাছ থেকে এজেন্সিশিপ নিয়েছে। কাজ হলো, বিভিন্ন কোম্পানির সম্পদ মূল্যমান বা এসেট ভ্যালুয়েশন করা। এরই ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি টেলিভিশন চ্যানেল এনটিভিরও সম্পদ মূল্যমান নির্ধারণ করে দিয়েছিল আইএইচএস। এনটিভির প্রসঙ্গ উঠতেই মিজানুর রহমানের চেহারার রঙে কিছুটা পরিবর্তন হলো। অথচ তাদের তৈরি সম্পদের মূল্যমান প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করেই সম্প্রতি এনটিভি পুঁজিবাজার থেকে মূলধন সংগ্রহের অনুমতি চেয়ে ব্যর্থ হয়েছে। প্রকৃত সম্পদের চেয়ে অস্বাভাবিক বেশি সম্পদ দেখিয়ে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের প্রলুব্ধ করে পুঁজিবাজার থেকে মূলধন সংগ্রহের তৎপরতার কথা বলতেই তিনি বললেন, 'সম্পদের দাম নিরুপণের বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থাকলে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা এসইসি তাদের কাছে জানতে চাইতে পারে। সাংবাদিককে এ বিষয়ে তিনি কোনো তথ্য দেবেন না। অথচ মিথ্যা তথ্য দিয়ে প্রসপেক্টাস সাজানোয় সহযোগিতা করতে পিছপা হয়নি। সেখানে তারা চট্টগ্রাম ও খুলনায় আইএইচএসের অফিস থাকার উল্লেখ থাকলেও বাস্তবে খুলনায় কোনো অফিস নেই।

এনটিভি'র শেয়ার বাজারে এলো না

দেশে পুঁজিবাজারের বয়স প্রায় ৫০ বছর হলেও এই প্রথম গণমাধ্যমের কোনো প্রতিষ্ঠান বাজার থেকে পুঁজি সংগ্রহের পদক্ষেপ নেয়। খবরটা জানার পর অনেক বিনিয়োগকারী খুশি হলেও একই সঙ্গে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল একটি বিষয়ে। কারণ, মাত্র দেড় বছর আগে চালু হওয়া একটি প্রতিষ্ঠান ১০০ টাকা দামের শেয়ারে ১০০ টাকা প্রিমিয়াম দাবি করেছে। এর মানে হলো কোম্পানির সুনাম এতো বেশি যে দ্বিগুণ দাম দিয়ে শেয়ার কিনতে হবে। হয়তো আগের রেওয়াজ চালু থাকলে এনটিভি শেয়ার ছাড়ার অনুমতি পেয়েও যেত। কিন্তু ২০০৩ সালের নভেম্বর থেকে দায়িত্ব পাওয়ার পর এসইসি'র বর্তমান চেয়ারম্যান ড. মির্জা আজিজুল ইসলাম কোনো প্রতিষ্ঠান বাজারে আসতে চাইলে তার প্রস্তাবনার বিভিন্ন দিক ঘুরিয়ে দেখতে দেশের দুই স্টক এক্সচেঞ্জের মতামত নেন। পুঁজিবাজার থেকে মূলধন সংগ্রহের জন্য এনটিভির প্রসপেক্টাস এরই ধারাবাহিকতায় ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) হাতে এল গত বছর ডিসেম্বরের শুরুর দিকে। কিন্তু দলিলটি হাতে পেয়ে ডিএসইর লিস্টিং কমিটি অনেকটাই নিরাশ হলেন। খতিয়ে দেখতে গিয়ে তারা অনেকগুলো অসঙ্গতি খুঁজে পেলেন। ৬ মাসের আগের অডিট রিপোর্টে উপস্থাপিত হিসাবের সঙ্গে ডিসেম্বরের প্রকৃত সম্পদের হিসাবের মধ্যে যথেষ্ট গড়মিল। সর্বশেষ (জুন ২০০৪) নিরীক্ষিত হিসাবে এনটিভির মোট স্থায়ী সম্পদ ছিল ৩১ কোটি ২২ লাখ ৮৪ হাজার ৪৭৯ কোটি টাকা। মাত্র ৬ মাসের ব্যবধানে (ডিসেম্বর ২০০৪) একই সম্পদের মূল্য প্রসপেক্টাসে দেখানো হয়েছে ৪৭ কোটি ৭১ লাখ ৯২ হাজার ১৬৬ টাকা। মানে মাত্র ছয় মাসে সম্পদের পরিমাণ বেড়েছে ৫০%-এর বেশি। একইভাবে ২০০৪-এর জুন মাসে যে জমি ১ কোটি ৮০ লাখ টাকা দিয়ে কেনা হয়েছে তার দাম ডিসেম্বরে এসে হয়ে গেছে ৮ কোটি টাকা। আরো মজার বিষয় হলো, ১ বছর ব্যবহার করার পর এনটিভির যেসব যন্ত্রপাতির দাম জুনে ছিল ২৭ কোটি টাকা, তা ৬ মাসের ব্যবধানে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৭ কোটি ৩১ লাখ টাকা। অথচ কোনো যন্ত্রপাতি ব্যবহারের পর তার ব্যবহারিক ক্ষমতা কমে এবং সে অনুযায়ী তার একটা অবচয় মূল্য ধরা হয়। অথচ এ ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতির নতুন দাম ধরে বেশি দাম দেখানো হয়েছে। শুধু তাই নয়, মাত্র দেড় বছর হলো চালু হওয়া এই স্যাটেলাইট চ্যানেলটির সুনামের দাম ধরা হয়েছে ২২ কোটি টাকারও বেশি। সম্পদের এই অতিরঞ্জিত তথ্যের কারণে ডিএসই এনটিভিকে প্রিমিয়াম না দেওয়ার জন্য সুপারিশ করে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনকে (এসইসি)। এসইসিও বিষয়টি গুরুত্বসহকারে নিয়ে এনটিভিকে তার সম্পদের প্রকৃত দাম নির্ধারণ করে পুনরায় আবেদন করতে বলে। ফিরিয়ে দেয়া হয় এনটিভির শেয়ারের প্রসপেক্টাস। ফলে অনেকেরই আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও ১০০ টাকার শেয়ারে ১০০ টাকা প্রিমিয়াম দাবি করে দেশের অন্যতম স্যাটেলাইট চ্যানেল এনটিভির পুঁজিবাজার থেকে ২০ কোটি টাকা সংগ্রহের আবেদন খারিজ হয়ে গেল।

এ সম্পর্কে এসইসির নির্বাহী পরিচালক মনসুর আলমের সঙ্গে আলাপকালে তিনি জানান, এখন প্রাথমিক শেয়ারের আবেদনের আইপিও অনুমোদন দেয়া হয় কোম্পানির ঘোষণার ভিত্তিতে। ফলে প্রসপেক্টাসে কোম্পানি নিজেদের ব্যালান্সশিটে যা তুলে ধরে সেটির গুণাগুণ ও সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের দায়িত্ব এসইসির নয়। এটি পরীক্ষা করে দেখার দায়িত্ব অডিটর, ক্রেডিট রেটিং কোম্পানি ও ইস্যু ম্যানেজারের। তারা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন না করলে বা পেশাদারিত্ব থেকে বিচ্যুতি ঘটলে সেটি এসইসি দেখে থাকে। তিনি আরো বলেন, তবে কোনো কোম্পানিকে মূলধন সংগ্রহের অনুমতিদানের আগে এসইসি স্টক এক্সচেঞ্জগুলোর মতামত নিয়ে থাকে। এনটিভির ক্ষেত্রে ডিএসই প্রিমিয়াম না দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। এসইসি ডিএসইর পরামর্শকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছে। এছাড়া অন্যান্য বিষয় খতিয়ে দেখে প্রাথমিক শেয়ার ছাড়ার এসইসি বিধিমালা অনুসরণ করা হয়নি। তাই এনটিভিকে তার সম্পদের সঠিক হিসাব নিরুপণ করে পুনরায় আবেদন করতে বলা হয়েছে। মনসুর আলম অবশ্য অধিক সম্পদ দেখানোর ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

এসইসির ব্যর্থতা

অধিক সম্পদ দেখিয়ে এনটিভি শেয়ারবাজার থেকে পুঁজি সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হলেও বিগত এক দশকে এ ধরনের বেশ কিছু জালিয়াতি ঘটেছে। এসব ঘটনার কিছু কিছু তদন্তও হয়েছে। এরপরও দোষীদের বিরুদ্ধে এসইসি কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। পুঁজিবাজার থেকে মূলধন সংগ্রহে জালিয়াতির অন্যতম বড় ঘটনা মার্ক বাংলাদেশ শিল্প অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেডের শেয়ার বাজারে আসা। সেটা

১৯৯৬ সালে। সরকার কর্তৃক ১৯৯৮-৯৯ থেকে ২০০১-০২ পর্যন্ত এসইসির যে পারফরমেন্স অডিট করা হয়, তাতে এ ঘটনার উল্লেখ করে দোষীদের বিরুদ্ধে শাস্তি ব্যবস্থা নিতেও বলা হয়েছিল। তবে অপরাধীদের ব্যাপারে এসইসি অজ্ঞাত কারণে নিশ্চুপ। অনুসন্ধানে জানা যায়, মার্ক শিল্প প্রাথমিক শেয়ার বাজারে ছাড়ার জন্য যে আবেদন করেছিল তাতে ব্যালান্সশিটে কোম্পানির মোট সম্পদের পরিমাণ দেখানো হয়েছিল ৪৭ কোটি ৪১ লাখ ১১ হাজার ৫১৪ টাকা। সে সময়ে আইপিও ছাড়ার নিয়ম অনুসারে এসইসিকেই কোম্পানির তথ্যের সত্যতা ও গুণাগণ বিচার করে অনুমতি দিতে হতো। মার্ক সু'র জন্য এসইসি সম্পদ বিবরণী যাচাই করতে পরিদর্শক কমিটি তৈরি করে। পরিদর্শক কমিটিতে যে তিনজন কর্মকর্তা জড়িত ছিলেন তারা হলেন তৎকালীন উপ-পরিচালক রুকসানা চৌধুরী, নির্বাহী পরিচালক নওশের আলী এবং সদস্য ড. এ কে এম সাহাবুব আলম। তবে প্রতিবেদন প্রদানের সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন এসইসি সদস্য আলমগীর কবির। এদের মধ্যে তিন জন এসইসিতে বর্তমানে কর্মরত না থাকলেও রুকসানা চৌধুরী ক্রামাগত পদোন্নতির মাধ্যমে বর্তমানে এসইসির নির্বাহী পরিচালক। এই কমিটির দাখিল করা প্রতিবেদনে বলা হয়, মার্কের মোট সম্পদের পরিমাণ কোম্পানির ব্যালান্সশিটে ঘোষিত সম্পদের চেয়েও বেশি, যার পরিমাণ ৫২ কোটি ৩৬ লাখ ১১ হাজার ৯০২ টাকা। পরিদর্শক কমিটি তাই মার্ক বাংলাদেশকে ১০০ টাকার শেয়ারে ১০০ টাকা প্রিমিয়াম দেওয়ার সুপারিশ করে এবং এসইসি মার্ক বাংলাদেশকে আইপিও ছাড়ার অনুমতি দেয়। নিয়ন্ত্রক সংস্থার অনুমতি সাপেক্ষে মার্ক বাংলাদেশ ১৯৯৬ সালে পুঁজিবাজারে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে ৩৯ কোটি ৯০ লাখ টাকার মূলধন সংগ্রহ করে। মার্ক বিডি কর্তৃক প্রকৃত সম্পদের অধিক মূল্য দেখিয়ে প্রতারণার মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহের অভিযোগ উঠলে এসইসি চেয়ারম্যান ২০০০ সালের ১২ জানুয়ারি বিষয়টি তদন্তের জন্য প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করেন। বুয়েটের সরেজমিন অনুসন্ধান রিপোর্ট অনুসারে কোম্পানির মোট সম্পদের পরিমাণ ৫ কোটি ৩৫ লাখ ১৪ হাজার ৫২৭ টাকা যা কোম্পানি কর্তৃক পেশকৃত সম্পদের চেয়ে ৪২ কোটি টাকা কম। মারাত্মক অনিয়ম ও প্রতারণা প্রমাণিত হওয়ায় অডিট রিপোর্টে সুপারিশ করা হয়, যেসব কর্মকর্তা এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া উচিত। কিন্তু অডিটের এই সুপারিশ বাস্তবায়ন হয়নি। অন্যদিকে মার্ক সু কোম্পানি আর বর্তমানে চালু নেই। স্টক এক্সচেঞ্জের নানা নিয়ম মানতে ব্যর্থতার কারণে কোম্পানিটি ইতিমধ্যে তালিকাচ্যুত হয়েছে। মাঝখান থেকে কোটি কোটি টাকা গচ্চা দিয়েছেন হাজার হাজার সাধারণ বিনিয়োগকারী।

বিগত কয়েক বছরে আর্থিক ভিত্তি মজবুত নয় বা কোম্পানি কর্তৃক ঘোষিত তথ্যের মধ্যে নানা অসঙ্গতির কারণে বেশ কিছু কোম্পানি এসইসি'র অনুমতি সাপেক্ষে মূলধন সংগ্রহ করেও স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হতে পারেনি। ডিএসইর পর্যবেক্ষণ অনুসারে ফাহাদ ইন্ডাস্ট্রিজ, খাজা মোজাইক টাইলস অ্যান্ড স্টোন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, জেএমআই বাংলা লিমিটেড ও ড্যাফোডিল কম্পিউটারস লিমিটেডের তালিকাভুক্তি না হওয়ার কারণ কোম্পানির ব্যালান্সশিটে উপস্থাপিত তথ্যের মধ্যে অসঙ্গতি। এমনকি ব্যালান্সশিটে উপস্থাপিত অনেক সম্পদের প্রয়োজনীয় দলিল ডিএসই পরীক্ষা করতে চাইলে কোম্পানিগুলো সেসব দেখাতে ব্যর্থ হয়। ফলে এসব কোম্পানি শেয়ার বাজারে এলে সাধারণ বিনিয়োগকারীরা প্রতারিত হবেন বলে সংশ্লিস্টরা মনে করেন।

এ নিয়ে আলাপ হয় ডিএসই প্রেসিডেন্ট আহমেদ ইকবাল হাসানের সঙ্গে। তিনি সমস্যাগুলোর বহুমাত্রিক দিক তুলে ধরে বলেন, 'দেশের মোট অর্থনীতির আকারের সঙ্গে তুলনা করলে পুঁজিবাজার এখনো ক্ষুদ্রই বলা চলে। সরকারের কিছু ইতিবাচক মনোভাবের কারণে বিগত এক বছরে বাজারে একটা চাঙ্গা অবস্থা দেখা যাচ্ছে। তবে পুরনো বিনিয়োগকারীদের ধরে রাখতে ও নুতন বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার মতো যথেস্ট শেয়ার বাজারে নেই। ফলে চাহিদার সঙ্গে যোগানের একটা ঘাটতি তৈরি হয়েছে। আর এই অবস্থারই সুযোগ নিচ্ছে একশ্রেণীর ভুয়া উদ্যোক্তা। তাদের এ কাজে সহায়তা দিচ্ছে বেশ কিছু মধ্যস্বত্বভোগী। অতীতে অনেক কোম্পানি শুধু বিল্ডিং আর সাইনবোর্ড দেখিয়ে বাজার থেকে মূলধন সংগ্রহ করেছে। পরে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থ অন্য ব্যবসায় খাটিয়েছে। ফলে অনেকেই প্রতারিত হয়েছে।' এ ধরনের ঘটনা আগামীতে যাতে না ঘটে ডিএসই সেজন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

নেপথ্যে কারা?

অনুসন্ধানে জানা গেছে, কোনো কোম্পানির তালিকাভুক্তির একটি শর্ত হচ্ছে ন্যূনতম ৪০০ জন সাধারণ শেয়ার মালিক থাকতে হবে। কিন্তু

প্রিমিয়ার ব্যাংক ইকবাল-মজিদ জুটির কারসাজি

তবে পুঁজিবাজার থেকে অর্থ সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে সম্ভবত এ যাবৎকালের সবচেয়ে বড় প্রতারণা ও জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছে তৃতীয় প্রজন্মের বেসরকারি ব্যাংক প্রিমিয়ার ব্যাংক। তবে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আগেভাগে শনাক্ত করে ফেলায় শেষ পর্যন্ত জালিয়াতির কাজটি আর হয়তো সম্পন্ন করা হবে না।

বাজারে প্রাথমিক শেয়ার ছেড়ে ৫৫ কোটি টাকা সংগ্রহের জন্য প্রিমিয়ার ব্যাংক এসইসির অনুমতি চায়। নানা ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে দফায় দফায় কাগজপত্র ও প্রসপেক্টাস জমা দিয়ে শেষ পর্যন্ত অনুমতি মিললেও আইপিওর চাঁদা সংগ্রহে নিজস্ব ব্যাংকের শাখার বাইরে সুযোগ রাখা হয় সামান্য দু-তিনটি ব্যাংকের। চাঁদা গ্রহণেরও সময় রাখা হয় খুব অল্প। বিষয়টি তুলে ধরে ডিএসই এসইসির হস্তক্ষেপ কামনা করে। ডিএসইর আশঙ্কা ছিল, এর ফলে সাধারণ বিনিয়োগকারীরা ঠিকমতো আবেদন করতে পারবে না বরং ব্যাংকের উদ্যোক্তা-পরিচালক ও তাদের লোকজন সব শেয়ার নিয়ে নেবে। এসইসির নির্দেশে শেষ পর্যন্ত চাঁদা গ্রহণকারী ব্যাংকের সংখ্যা বাড়ানো হলেও গোপনে শুরু হয় বিশাল এক অপকীর্তি।

সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সিস্টেমের আওতায় প্রাথমিক শেয়ারে আবেদন করতে হলে বিনিয়োগকারীর একটি বিও (বেনিফিশিয়ারি ওনার) হিসাব খুলতে হয় এসইসি অনুমোদিত যেকোনো ডিপির (ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট) সঙ্গে। প্রিমিয়ার ব্যাংকের ডিপি শাখায় হাজার হজার ভুয়া হিসাব খোলা হয় মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যে। আবার বিও একাউন্ট খুলতে হলে অবশ্যই একটি ব্যাংক হিসাব লাগবে। গণহারে প্রিমিয়ার ব্যাংকের তিনটি শাখা গুলশান, মহাখালী ও ইমামগঞ্জ শাখায় এসব হিসাব খোলা হয়ে যায় একই সময়ে। সব মিলিয়ে ২৫ হাজার বিও হিসাব খোলা হয়েছে আর এজন্য ব্যবহার করা হয়েছে চট্টগ্রামের আসাদগঞ্জ ও আসকারাবাদের দুটি ঠিকানা। এসইসির প্রাথমিক অনুসন্ধানে আরো জানা গেছে, তার বেশির ভাগই নিয়ম-কানুন না মেনে অসম্পূর্ণভাবে হিসাব খোলা হয়েছে। অনেক হিসাবে নাম থাকলেও কোনো ঠিকানা নেই, নেই পাসপোর্টের কপি বা ওয়ার্ড কমিশনারের প্রত্যয়নপত্র। গণহারে মাত্র ৫০ টাকা দিয়ে হাজার হাজার ব্যাংক হিসাব খোলা হয়েছে।

গত ১২ ফেব্রুয়ারি এসইসি তাই প্রিমিয়ার ব্যাংকের আইপিও স্থগিত করে তদন্ত আরম্ভ করেছে। এসইসির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এসব হিসাব থেকে বেনামে আবেদন করে প্রচুর পরিমাণ শেয়ার ব্যাংক সংশ্লিষ্ট নিজস্ব লোকজনের কাছে চলে যেতো। তখন তারা ঐসব শেয়ার ধরে রেখে বাজারে কৃত্রিমভাবে দাম বাড়িয়ে আকর্ষণ সৃষ্টি করত এবং সুযোগ বুঝে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের কাছে চড়াদামে ছেড়ে

ফাহাদ ইন্ডাস্ট্রিজের প্রাথমিক শেয়ারের গ্রাহক ছিল মাত্র ২০৭ জন, এর মধ্যে ৭ জন অবলেখনকারী। কোনো শেয়ার মূলধন সংগ্রহের ঘোষণা দিয়ে যদি পর্যাপ্ত আবেদনকারী না পায় তখন অবলেখনকারীরা শেয়ার কিনে নেন। ফাহাদ ইন্ডাস্ট্রিজের প্রাথমিক শেয়ার বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে না পারায় অবলেখনকারীরা কিনে নেয়। খাজা মোজাইক তার স্থায়ী সম্পদের অনেক কিছুরই নথিপত্র জমা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। জমি ও জমি উন্নয়নের ১ কোটি ৮১ লাখ টাকার কাগজপত্র, আয়করের ১ কোটি ৬ লাখ টাকা ভ্যাটের কাগজ কোনো কিছুই ডিএসইকে দেখাতে পারেনি প্রতিষ্ঠানটি। জেমমআই বাংলা লিমিটেড তাদের প্রসপেক্টাসে ঘোষিত যন্ত্রপাতির অনেক কিছুই দেখাতে পারেনি। আর ড্যাফোডিল কম্পিউটারের বিষয়টি আরো রহস্যময়। কোম্পানি ২০০০-০১ সালে তিনজন উদ্যোক্তার কাছে শেয়ার বিক্রি করে ৯ কোটি ৫০ লাখ টাকা মূলধন সংগ্রহ করলেও ২০০১ সালের ৩০ জুনের নিরীক্ষিত হিসাবে তারা কোম্পানির মোট পরিশোধিত মূলধন মাত্র ৫০ লাখ টাকা দেখায়।

তবে এ ধরনের প্রতারণার সঙ্গে শুধু যে উদ্যোক্তা জড়িত তা নয়। মূলধন বাজারের একশ্রেণীর মধ্যস্বত্বভোগী এ কাজে সহায়তা করে যাচ্ছে দিনের পর দিন। কোম্পানির ইস্যু ব্যবস্থাপক, অডিটর, ক্রেডিট রেটিং কোম্পানি সকলেই প্রতারণার কাজে কোনো না কোনোভাবে সহায়তা করছে। যেমন হয়েছে এনটিভির ক্ষেত্রে। এনটিভির সম্পদের দাম যে প্রতিষ্ঠানটি নিরূপণ করেছে সেটি একটি জার্মান কোম্পানির এজেন্সি নিয়ে কাজ করলেও তাদের গুণগত মান নিয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে, যা ডিএসই'র পর্যবেক্ষণেও বিষয়টি উঠে এসেছে। আর এনটিভির অডিট সম্পন্ন করেছে সাইফুল শামসুল আলম অ্যান্ড কোম্পানি। এই প্রতিবেদক যখন ফার্মের স্বত্বাধিকারীর সঙ্গে সশরীরে সাক্ষাৎ করে বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে চান, শামসুল আলম ক্ষিপ্ত হয়ে যারপর নাই দুর্ব্যবহার করেন। এক পর্যায়ে সাংবাদিককে দেখে নেয়ার হুমকি-ধামকিসহ আক্রমণাত্মক আচরণ কর পরিচয়পত্র কেড়ে রেখে দেয়ার ঔদ্ধত্য দেখান। সম্ভবত নিজের অপরাধ ঢাকতেই তার এমন রূপ। তবে দেশের অডিটরদের মান ও পেশাগত সততা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে নানা প্রশ্ন উঠেছে। সম্প্রতি এসইসি এরকম কিছু ভুয়া অডিটের প্রসঙ্গ তুলে অডিটরদের পেশাগত সংগঠন আইক্যাবের কাছে এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে বলেছে। আবার এনটিভির ক্রেডিট রেটিংয়ের কাজটি করেছে যে কোম্পানি তার বয়স মাত্র বছরখানেক। ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি অব বাংলাদেশ নামের এই প্রতিষ্ঠানটি যে প্রতিবেদন তৈরি করেছে তাতে স্বাধীন কাজের বিন্দুমাত্র উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় না। সম্পদের দাম নিরূপণে আইএইচএস যে পদ্ধতি ও হিসাব দিয়েছে তাকে বিনা প্রশ্নে তারা মেনে নিয়েছেন। এনটিভির ব্যবহৃত সম্পদের দাম ৬ মাস পরে ১০ কোটি ২৯ লাখ টাকা বেড়েছে উল্লেখ করলেও সে সম্পর্কে তারা কোনো প্রশ্ন তোলেনি। বরং ক্রেডিট রেটিং প্রতিবেদনের রেটিং পর্যবেক্ষণে তারা বলেছে, তাদের ক্রেডিট রেটিংয়ের পুরো ভিত্তি হচ্ছে আইএইচএসের তথ্য ও সাইফুল শামসুল আলম কোম্পানির অডিটের প্রতিবেদন। সুতরাং, কোনো ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকলে সেটির জন্য তারা দায়ী নন। কি চমৎকার দায়সারা কান্ড!

কে নেবে দায়?

এভাবে বাজার সংশ্লিষ্ট এসব পক্ষের নিজ কাজে পেশাদারিত্ব না রেখে প্রতারক উদ্যোক্তাদের সহায়তা করার ফলে আজ অনেক নিম্নমানের কোম্পানির শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্ত। ডিএসইর কাছ থেকে পাওয়া এক হিসাবে দেখা গেছে, ১৯৯৩ সালের পর থেকে ১৩৩টি কোম্পানির শেয়ার বাজারে এলেও তাদের অর্ধেকেরও বেশি কোম্পানির শেয়ারের দাম বর্তমানে অভিহিত মূল্যের চেয়ে কম। অনেকগুলোর উৎপাদন কর্মকান্ড বর্তমানে বন্ধ। এরকম কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে ৬ মাস আগে ডিএসই তালিকাচ্যুত করেছে। যার মধ্যে আছে মার্ক বিডি, মেঘনা ভেজিটেবল, জিইএম নিটওয়্যার, প্যারাগন লেদার, জেএইচ কেমিক্যাল। আর সম্প্রতি খোদ নিয়ন্ত্রক সংস্থা এসইসি বার্ষিক সাধারণ সভা করতে ব্যর্থ বা উৎপাদন কর্মকান্ড বন্ধ আছে এরকম ৩৬টি কোম্পানির একটি তালিকা প্রস্তুত করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও রেজিস্টার অব জয়েন্ট স্টক অব কোম্পানিজের কাছে পাঠিয়ে এগুলোকে কোম্পানি হিসেবে বিলোপ করতে অনুরোধ জানিয়েছে। এসইসির এই পদক্ষেপে বাজার সংশ্লিষ্ট একটা পক্ষ সন্তোষ প্রকাশ করেছে। তাদের মতে অবশেষে মন্দদের বিদায় করতে পদক্ষেপ নিল এসইসি। কিন্তু অনেকেরই প্রশ্ন কোম্পানি বিলোপ হলে বাজারের স্বচ্ছতা হয়ত বাড়বে। কিন্তু এসব উদ্যোক্তা ও মধ্যস্বত্বভোগী প্রতারক চক্রের ফাঁদে পড়ে সাধারণ বিনিয়োগকারী অনেকেই যে ফতুর হয়েছে তার দায় কে নেবে?

দিত। এতে তারা প্রচুর পরিমাণ অর্থ পকেটস্থ করত।

পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট ব্রোকার-ডিলার থেকে সাধারণ বিনিয়োগকারী সবাই প্রিমিয়ার ব্যাংকের এই ঘটনাকে চরম প্রতারণামূলক ও ঠকবাজির অপচেষ্টা বলে অভিহিত করেছেন। সময়মতো বিষয়টি চিহ্নিত করতে পারায় তারা এসইসিকেও ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এসইসি ইতিমধ্যে তদন্ত আরম্ভ করেছে। নির্বাহী পরিচালক মনসুর আলমকে প্রধান করে চার সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে। কমিটি ৪৫ দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করবে। সেই অনুযায়ী আইনি ব্যবস্থা নেয়া হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকও বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে নিয়েছে। একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, একই ঠিকানায় অনেকগুলো হিসাব খোলা হলে তা এন্টি-মানি লন্ডারিং আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তারাও বিষয়টি তদন্ত করার জন্য কাজ আরম্ভ করেছেন।

এদিকে প্রিমিয়ার ব্যাংকের এহেন কেলেঙ্কারীর ঘটনা ফাঁস হয়ে পড়ায় ব্যাংকের গ্রাহকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। অনেকেই এই ব্যাংকে অর্থ গচ্ছিত রাখা নিরাপদ নয় বলে ভাবতে শুরু করেছেন। এজন্য তারা সংশ্লিষ্ট শাখাগুলোয় গিয়ে খোঁজ-খবরও নিচ্ছেন। ঘটনার পরদিন মতিঝিলের একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের একজন নির্বাহী মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই মেয়াদি আমানত ভাঙিয়ে ফেলতে যাচ্ছেন বলে জানান। বড় বড় কর্পোরেট গ্রাহকও অন্য ব্যাংকে ব্যবসা স্থানান্তর করার কথা ভাবছেন বলে জানা গেছে।

অবশ্য প্রিমিয়ার ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও এমডি দু'জনেই অনিয়ম করে এ ধরনের বেনামি হিসাব খোলার বিষয়টি সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। সবচেয়ে মজার বিষয়, দু'জনেই দাবি করেছেন তাদের মধ্যে কোনো পারস্পরিক যোগসাজশ নেই। কাজি মজিদ সাপ্তাহিক ২০০০কে টেলিফোনে বলেন, 'আমরাও বিষয়টি তদন্ত করে দেখব যে, কিভাবে অনিয়ম হলো।' তবে তিনি আর কোনো কথা বলতে রাজি হননি। তবে ব্যাংকপাড়ার অনেকেই মনে করেন, এহেন অপকীর্তির মূল নায়ক ব্যাংকের এমডি নিজে। বিতর্কিত এই ব্যাংকারটি একাধিক আর্থিক অনিয়মের দায়ে অভিযুক্ত হন প্রাইম ব্যাংকে কর্মরত থাকা অবস্থায় । শেষ পর্যন্ত তাকে প্রাইম ব্যাংক ছাড়তে হয়। এরপর তিনি প্রিমিয়ার ব্যাংকে যোগদান করেন উপদেষ্টা হিসেবে। নামে উপদেষ্টা হলেও ব্যাংক পরিচালনার সর্বময় ক্ষমতা কার্যত তার হাতেই কেন্দ্রীভূত হয়। তৎকালীন এমডি ইউসুফ খান হয়ে পড়েন নিষ্ক্রিয়। ইউসুফ খানের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে তার স্থলাভিষিক্ত হন মজিদ। উপদেষ্টা থাকা অবস্থায়ই চেয়ারম্যান ইকবালের সঙ্গে খুব ভালো বোঝাপড়া হয়ে যায়। এমডি হওয়ার পর তা আরো বাড়ে। অবশ্য এখন এ প্রশ্নও দেখা দিয়েছে যে, পরিচালনা পরিষদে আরো যারা উদ্যোক্তা পরিচালক আছেন, তারাও এ ধরনের অপকীর্তিতে সমর্থন দিয়েছেন কিনা? এতো বড় কেলেঙ্কারী ঘটনায় শুধু চেয়ারম্যান-এমডি নয়, ব্যাংকের বোর্ডের প্রত্যেকেরই দায়িত্ব রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ও এসইসির তদন্তের পর এদের পরিণতি কি হয় তা দেখার জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছে সবাইকে।